খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এঁর
মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো

রাজকুমার সাধুখাঁ
উপ-পরিচালক: প্রেসিডেন্ট'স সেক্রেটারিয়েট
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

১. সমগ্র মানবজাতির সেবাই মিশনের ব্রত:

স্রষ্টা যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। কাজেই কোন জাতিকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন ধর্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। সকলের প্রতি সহনশীলতাই হবে মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। মহান সৃষ্টিকর্তা হজরত মোহাম্মদ (স.) কে সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মধ্যস্থল আরবদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরিধি কোন জাতি বা ধর্ম-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন স্রষ্টার প্রেরিত সর্বশেষ মহাপুরুষ। পৃথিবীতে তাঁর পূর্বে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা যে সব পথের নির্দেশ দেন ইসলামের মধ্যে তার অধিকাংশই বিদ্যমান। ইসলামেই সকল ধর্মের নির্যাস সঞ্চিত আছে। সর্বশেষে ইসলামই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে এসেছে। অবশ্য কোন ধর্মের, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। সকল ধর্মের মূলনীতি এক। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। চিত্তশুদ্ধিই হলো সব এবাদতের সার; আর সেই সঙ্গে অপরের কল্যাণ কামনা করা।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কোন জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মকে হেয় মনে করে না, যেহেতু প্রত্যেক বান্দার মধ্যে খোদার নূর বা শক্তি নিহিত আছে। পুরাকাল হতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে খোদাওয়ান্দ করীম মহাপুরুষ প্রেরণ করে আসতেছেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) ছিল কিরূপে বান্দা পশুত্ব হতে মুক্ত হয়ে রূহানী শক্তি বৃদ্ধি সাধনে তৎপর থাকতে পারে। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে সমগ্র জাতি, সমগ্র ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৎ, তাদের খেদমত করলে খোদার সন্তুষ্টি সাধিত হয়। সারা ভূ-মণ্ডল এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সেবা- প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টারই সেবা। একটি বৃক্ষ তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে, সমগ্র জীবজন্তুকে আশ্রয় ও ছায়া দান করে। আমিত্বকে বর্জন করে, খোদীকে বিদায় দিয়ে, রিয়াকে পরিহার করে, ক্রোধকে জয় করে সর্বভূতে খেদমতে ব্রতী থাকা বান্দার একান্ত কর্তব্য। (হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী হতে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত)।

সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণে আত্ম-নিবেদিত একজন আদর্শ মহান ব্যক্তি ছিলেন হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'র মূলাদর্শে মানুষে মানুষে একতা ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধনে যে আহ্ছানিয়া মিশন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে আদর্শ ছিল তাঁর সারা জীবনের কর্ম ও সাধনা। তিনি ছিলেন স্রষ্টার এবাদতে উপ-মহাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক, সৃষ্টের সাধনায় ছিলেন একজন অনন্য কর্মবীর। মানব জাতির কল্যাণে তিনি বিভিন্নমুখী কর্মসম্পাদন করেছেন সক্রিয়ভাবে, তেমনি তাঁর কৃত ও আরাধ্য কাজের কর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, মানুষে মানুষে পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করতে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুসারীসহ সকল মানব সমাজকে। তাঁর সে অনুপম আদর্শ ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে নিরলস আত্ম-নিবেদনে কাজ করে যাচ্ছে 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'। এ দায়িত্ব পালনে তাঁর সাধনা সম্পূরণে অর্থাৎ মানবের আত্মিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও নিরলসভাবে কাজ করছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং মানবসেবায় মিশনের বহুমাত্রিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। মিশন ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে একাধিক পুরস্কার পাচ্ছে।

২. মানবসেবার ব্রত নিয়ে মিশন প্রতিষ্ঠা:

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ নলতা শরীফে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন ও নিঃস্বার্থে পরোপকারে ব্রতী হন এবং প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করতে উপদেশ দেন। মিশনের শুরুতে মৃত দেহের সৎকার, কলেমাখানি ও পল্লী-উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ কার্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। মিশনের কার্যকারিতা দেখে এর প্রতি বয়োবৃদ্ধদের মনযোগ আকৃষ্ট হলো। মিশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে কলেরা প্রশমিত হলো। নূতন নূতন সদস্যদের অর্ন্তভুক্তির ফলে মিশন শক্তিশালী হতে থাকল। ক্রমে অন্যান্য গ্রামেও নলতার অনুকরণে মিশন গঠিত হলো। মিশন কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় পুরুষানুক্রমে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়া সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ ও মানুষের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উলব্ধি করার পরামর্শ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠাতার প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও আদর্শের আলোকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর অবস্থানগত পরিবর্তনে জনকল্যাণমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসেবায় নিরলসভাবে কাজ করছে- বিশেষভাবে নারীদের পশ্চাদপদতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে।

মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবন সাধনা ছিল জাগতিক বিধান এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যেকে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হওয়া। তাই আহ্ছানিয়া মিশনের মানবসেবামূলক কার্যক্রমকে নিছক জাগতিক কোন কার্যক্রম বলে তিনি মনে করেননি। বরঞ্চ মানব কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত সমস্ত কর্মকাণ্ডই তিনি ধর্মীয় কাজ বলে মনে করতেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাঠ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সামগ্রিক মানব কল্যাণে বহুমূখী কার্যক্রমের মাধ্যমে মিশন প্রতিষ্ঠাতার ভাবনা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রতিফলিত হচ্ছে। আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীরা নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম-এর নেতৃত্বে মিশনের ব্যাপক বিস্তৃতি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন এই কামিল সুফীর আরেক খাস কারামত। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মিশনের সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আজ দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত ও স্বীকৃত।

মানুষের মধ্যে মহব্বত পয়দা করাই মিশনের প্রধান লক্ষ্য। ঈর্ষা, দ্বেষ, অহঙ্কার, হিংসা-বৃত্তিকে দমন করিয়া রূহের শক্তি প্রসার করাই মিশনের উদ্দেশ্য। সমাজে শান্তি-সৃষ্টি করা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। মিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন। "আমরা নিজে যা করি না, অপরকে প্রায়ই তাই করিতে বলি। সুতরাং আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়ে না। বাক্যের দ্বারা খেদমত হয় না, কার্য্যের দ্বারা হয়। মানুষ চায় দৃষ্টান্ত। মানুষ চায় আদর্শ।" আফসোসের সুরে এ উচ্চারণ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর। সারা জীবনের লালিত আদর্শ ও দর্শনকে কাজে পরিণত করার প্রত্যয়ে তিনি স্থাপন করেছিলেন 'আহ্ছানিয়া মিশন'। (ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবনদর্শনের মূলকথা: 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা', পৃষ্ঠা: ৫)।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন নিপীড়িত মানব সমাজ-সংলগ্ন অধ্যাত্ম সাধক। একই সঙ্গে তার মধ্যে ছিল অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনি সমাজ মনস্ক ছিলেন এবং নানামূখী সমাজ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। মিশনের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও জীবনমূখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন এবং মিশন কর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করতে হবে এবং সকল সৃষ্টিকে ভ্রাতৃবৎ গণ্য করতে হবে। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সেবাই হবে আমাদের পরম কর্তব্য। স্রষ্টার সৃষ্টিকে সেবা করলেই তার সন্তুষ্টি সাধিত হবে। সন্তানকে

ভালোবাসলে মাতা-পিতার সন্তুষ্টি সাধিত হয়। সেরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক জীবকে এমনকি প্রত্যেকটি জড় পদার্থকে ভ্রাতৃবৎ মনে করা অপরিহার্য।

৩. মানব সেবার পরিধি সার্বজনীন:

শিক্ষাবিদ ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়-এর বর্ণনায় যেভাবে ফুটে উঠেছে- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ধর্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু নিজে নন, এধরণের অসাম্প্রদায়িক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি তাঁর ভক্তকুলকে। তাই কোরআনের বাণী ও পরমহংসের উক্তি'র ঐক্যকে অভিনন্দিত করতে তাঁর বাঁধেনি। এছাড়া বহু মনীষী, শিক্ষাবিদ তাঁকে আধ্যাত্মিক পুরুষ, কেহ পীর, কেহ মানবতাবাদী, কেহ আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত, কেহ ইসলামিক চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসাবে অভিহিত করেছেন। (আ.শ.ম. বাবর আলী, দীপ্তপ্রভায় আলোকিত মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র., পৃষ্ঠা: ২৩২)।

বর্তমান যুগে যে শক্তিমান মহাপুরুষ তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, অসাধারণ ত্যাগ, অলৌকিক জীবন এবং অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা মানব সমাজকে মোহিত করেছেন, সেই মহাপুরুষ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন- সকল প্রশংসা, সকল স্তুতি, সকল ধন্যবাদ, সকল কৃতজ্ঞতা একমাত্র প্রাপ্য, সেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার, যিনি মানবকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানব সেবার জন্য পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁর পদপ্রান্তে শতকোটি ছালাম।

দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা ও মানব সেবার মহান ব্রত নিয়েই উপমহাদেশের এক সঙ্কটময় মূহুর্তে মুসলিম সমাজে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর আবির্ভাব ঘটে ছিলো; আর বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে ঘটেছিলো তাঁর জীবনের সফল পরিণতি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) গভীর মানবপ্রেম ও বন্ধন রচনা করে সমাজ গড়তে চেয়েছেন এবং সে অর্থেই নিজেকে উৎসর্গ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। মানবসেবার মহানব্রতে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। সেবার মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের পথসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। অহংবোধকে পরিহার করে সর্বমানবের সঙ্গে মিতালী স্থাপন, ভাবের আদান-প্রদান করা এবং সৃষ্টের প্রতি মমত্ববোধের মাধ্যমে পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। আবার ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে পরম শান্তি-অন্বেষায় সামাজিক আন্দোলনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন।

৪. মানব সেবার ক্ষেত্র:

মিশনের 'মূখ্য উদ্দেশ্য' নির্ধারণের মধ্যে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর মানবসেবার দায়বদ্ধতার উদাহরণ মেলে। তিনি যে একটি ভালোবাসাময় সমাজ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক সৃষ্টির কামনা করতেন তা মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর মন ও ভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানুষের সেবা করার মধ্যেই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করেছেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি শহরে বসবাস করেছেন। কিন্তু সে জীবন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি পল্লীর কোণে আশ্রয় নেন এবং এখানে বসে মানুষের সেবা করাকে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কেবল শিক্ষা বিস্তার বা সংস্কারেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজকে নিয়োজিত রাখেননি, মানবকল্যাণ ও উন্নয়নে তিনি নিজকে ব্যাপৃত করেছিলেন। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'বেকার হোস্টেল', মোসলেম ইনিষ্টিটিউট, 'টেলার হোস্টেল', কারমাইকেল হোস্টেল প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে। রাজশাহীর 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর অবদান বাঙ্গালী জাতি চিরকাল পরম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে।

"খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের মৌলিক ধারণা বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো ছিল গতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং সময়োপযোগী। সময়, বিশ্বপ্রেক্ষিত, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার। তাই সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, স্বধর্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধন এবং সর্বোপরি মানব সেবার পরিধি ছিল অপরিসীম।" (ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র. এঁর শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, পৃষ্ঠাঃ ১০৪ ও ১০৬)।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (র.) এঁর কৃতিত্বপূর্ণ দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল রাজশাহীতে। তিনি রাজশাহীর কথা জীবনে কখনোই ভুলেননি এবং বিশেষত রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিক। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) স্বজাতি, স্বসমাজ হিতৈষী ও মানব দরদী মহামানব ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর ছিলো শ্রদ্ধা ও সমবেদনা। কিন্তু অবহেলিত অনগ্রসর স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো অপরিমেয়। তাঁর জীবনের মহান ব্রত হয়ে উঠেছিলো 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'। আর প্রধান কর্মযজ্ঞ হয়েছিলো অবহেলিত, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের আত্মোপলব্ধি ও চেতনার উত্তরণে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সামগ্রিক অর্থে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন মিশনারী উদ্যোগের মানুষ। ধর্মের সঙ্গে কর্মের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে বড় বড় কাজ করে দেখিয়েছেন তিনি।

৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (র.) এঁর জীবণ বিশ্লেষণঃ

গভীর ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মনীষী হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সমাজের দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এজন্যে তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সে সময়ে, ভিক্ষালব্ধ অর্থে দারিদ্র্যবিমোচনের এমন উদ্যোগ কেবল বিরল নয়, অভিনবও বটে। তেত্রিশ বছরের চাকুরী জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর পরবর্তী সময়ে তিনি স্বদেশবাসীর 'রুহানী খেদমত' এবং সমাজ সেবার জন্য 'আহ্ছানিয়া মিশন' গড়ে তোলেন যা বর্তমানে মানবকল্যাণ ও বহুমূখী সেবায় অবদান রেখে চলেছে। আহ্ছানিয়া মিশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অনেকখানি জুড়ে ছিলো দুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান। তিনি তাঁর ভক্তের পত্রে তাইতো আকুতি জানিয়েছেন- "প্রতিবেশী, দুস্থ, পীড়িত, ক্ষুদিত জীবের খবর লইবে, তাহাদের দুঃখ মোচন করিবে। হিন্দু, মোসলেম, খৃষ্টান ও জীবজন্তু- ছাগল, গরু, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী সকলের প্রতি সহানুভূতি করিবে, এমন কি বৃক্ষ, লতা, জড়, অজড় সকলের প্রতি সদয় থকিবে।" তিনি ভক্তের পত্রের আরেকটি পত্রে তার এক ভক্তঅনুসারীকে লিখেছেন- "তাহারই ওয়াস্তে সমগ্র জীবের খেদমত কর, নিকৃষ্ট জীবকে ঘৃণা করিও না, পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া করিও, দরিদ্রের অশ্রু-জল নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিও, কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ গণনা করিও না, প্রেমময়ের ইয়াদ ব্যতীত একটি শ্বাসও নিক্ষেপ করিও না।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র., ভক্তের পত্র)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্বে নিত্য নূতন ভূমিকায় ও ভাবদর্শনে আবির্ভূত হয়েছেন। চাকুরি জীবন থেকে অবসরের পর তিনি শুরু করেন বাস্তব জীবনের আর এক অভিনব অধ্যায়। তাঁর ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবন তিন ভাগে বিভক্ত, যেমনঃ জন্ম থেকে শিক্ষা জীবন; সরকারী চাকুরি জীবন; এবং সংসার ধর্ম থেকে অবসর নিয়ে তাঁর 'নলতা জীবন', যা দৃশ্যত আধ্যাত্মিক বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও তখনও তিনি জনজীবনের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন। মানুষ সম্পর্কে তাঁর একান্ত ভাবনা ও বিবেচনার নির্যাস হলো `The heart of mankind is the temple of God'। এটা তিনি জানতেন এবং মানতেন বলে তাঁর উক্তি আর উপলব্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনে থাকতেন সদা সচেতন - ঐশী প্রেমই সব সমস্যার সমাধান।

চাকুরি জীবনে একনিষ্ঠ কর্ম সাফল্য, সরকারী শিক্ষা নীতির সমর্থন ও সফল বাস্তবায়নের জন্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর আহ্ছানউল্লাকে ১৯১১ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর অনবদ্য অবদান- শিক্ষা ও মানবকল্যাণ কামনা, সমাজসেবা, ধর্মবোধের বিস্তারকল্পে মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কলকাতায় মখদুমী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের লেখা সত্তরটির অধিক বই প্রকাশ করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর শিক্ষা আন্দোলনের সাফল্য সুবিস্তৃত এবং সুগভীর বলেই তাঁর নাম বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং এ দেশের জনসাধারণ তাঁর ভূমিকার যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র সমাজ চিন্তা:

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর কর্মকাণ্ড সর্বদাই জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্ধে ছিল। তিনি মূলত একটি বৈসম্যহীন সমাজেরই স্বপ্ন দেখতেন। তিনি মুসলমান হিসাবে ছিলেন একজন খাঁটি সাচ্চা মুসলমান এবং সর্বদাই ছিলেন খোদার ইশ্কে মশগুল। তিনি সর্বদা দরিদ্র নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মহব্বত পাওয়া ও তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। তাইতো তিনি বলেছেন- "প্রত্যেকটী মানব ভ্রাতৃস্বরূপ; পুত্রকে অনাদর করিলে যেমন পিতা-মাতার বিরাগভাজন হইতে হয়, সেইরূপ কোন মানবকে ঘৃণা বা অনাদর করিলে স্রষ্টার বিরাগভাজন হইতে হয়। সূর্য্য এবং বায়ূ সমগ্র পৃথিবীকে সমভাবে সেবা করে; কেবল কোন জাতি বিশেষকে সেবা করে না। সেইরূপ প্রত্যেক সৃষ্টের পরস্পরকে সমচোখে দেখা ও সমভাবে সেবা করা কর্ত্তব্য, সে যে জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন। আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের সেবা করা এবং স্রষ্টার মহব্বত লাভ করা।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র. রচনাবলী)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন এমনি এক মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব যিনি সমকালীন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, সমাজ-ভাবুক ও আধ্যাত্মচেতনার সিদ্ধপুরুষ। শিক্ষাবিস্তার, সমাজভাবনা, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, অনুশীলন ও সাধনা, সাহিত্যচর্চা, সৃষ্টি-রহস্যের অন্বেষা তাঁর জীবনভর সাধনারই এক এক অধ্যায়। তিনি দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন।

শিক্ষাচিন্তায় ও সমাজভাবনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সেবার আদর্শের বিকাশ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নারী শিক্ষা ও অধিকার উন্নয়নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ভাবনা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর সব কিছুর মূলে ছিল- মানুষের সেবা, শিক্ষার সেবা ও সংস্কৃতির সেবা। এই লক্ষেই তিনি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন আহ্ছানিয়া মিশন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন মিশনারি মনের মানুষ, স্বল্পভাষী এবং নীরব কর্মী। নীরবে কাজ করে একটি পশ্চাদমুখী জরাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে কিভাবে বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনা যায়, তাঁর এক উজ্জ্বল এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবনধারা" মূলত তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবৃতি নয়, বরং সৃজনশীল এক কর্ম সাধকের জীবনালেখ্য। 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এই দর্শনের ভিত্তিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর সমাজ ভাবনার বিকাশ ও বাস্তবায়ন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, আর সেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ তথা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা ছিল তাঁর জীবনসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মিশনের যাবতীয় মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার একটি যোগসূত্র নির্মাণ করাই হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। আহ্ছানিয়া মিশনকে তাই পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মবোধক হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্যে তার জীবন দর্শনকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আজীবন কর্মসাধনা করে গেছেন। তার এই সাধনা ও আদর্শকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দারিদ্রবিমোচনে বহুমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৭. উপসংহার

মানব জাতির কল্যাণের আলোকবর্তিকা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই ধুলির ধরণীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, দেশ বরেণ্য সমাজসেবক, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছুফী সাধক, সাহিত্য সাধক এবং জননন্দিত জ্ঞান তাপস

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী মুসলমানদের অহংকার এবং সমকালীন আলোকিত মানুষ। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন অপূর্ব বিনয়ী মানুষ। তিনি তার কর্মের মাধ্যমেই আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। শিক্ষা সংস্কার ও সম্প্রসারণ, সমাজ উন্নয়ন, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে যে অবদান রেখেছেন তার জন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবন ছিল একজন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। আর সে জীবনের মূল রহস্য ছিল মানব সেবায় ব্রতী হওয়া। তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত একজন যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ; সমাজ ও মানব জাতির কল্যাণ কামনায় মগ্ন ছিলেন তিনি। আমরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো অনন্তকাল পর্যন্ত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও সাধক পুরুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর মানবসেবার পরিধি ও কাঠামোর অর্থবহ বাস্তবায়ন ঘটেছে মানব কল্যাণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বহুমূখী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রশংসনীয় কার্যক্রমের জন্য মিশন এ পর্যন্ত অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। মিশনের সামগ্রিক সফল্যের মূলে রয়েছে মিশন প্রতিষ্ঠাতার ভাবনা ও আদর্শ এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে মিশনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা ও জনাব কাজী রফিকুল আলম-এর সফল, নিঃস্বার্থ ও গতিশীল নেতৃত্ব।

গবেষক ও প্রবন্ধকার: রাজকুমার সাধুখাঁ
উপ-পরিচালক: প্রেসিডেন্ট'স সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
সহযোগী: জনাব সাইফুল ইসলাম
কো-অর্ডিনেটর: 'বি স্কিলফুল' প্রজেক্ট, টিভেট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

তথ্যসূত্র:

১. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
২. আমার জীবন-ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৩. ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তাঁর কর্মসাধনা, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।
৫. দীপ্তপ্রভায় আলোকিত মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.), আ. শ. ম. বাবর আলী।
৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।
৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবনদর্শনের মূলকথা: স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা, ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।
৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): একান্ত অনুভব, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন।
৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): রচনাবলী।

* ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিনারে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ রোজ শনিবার বেলা ২ ঘটিকায় মিশন মিলনায়তনে উপস্থাপিত।